SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ধর্ম, ধর্মনীতি ও কর্তব্যকর্ম: অক্ষয় কুমার দত্তের দর্শনালোকে একটি পর্যালোচনা

সঙ্গীতা পাল

ভূমিকা :

দর্শনচর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে 'ধর্ম' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শন – উভয় দর্শনেই ধর্ম বিষয়ে অলোচনা কোনো নতুন বিষয় নয়। তবে 'ধর্ম'কে পাশ্চাত্য দর্শনে যে রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে 'ধর্ম'কে 'religion' অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।এদিক থেকে কোনো বিশেষ ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝানে হয়। নীতিবিদ্যার সাথে তাই ধর্মদর্শনের পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনচর্চার আলোকে ধর্ম হল একটি মানবিক মূল্যবোধ। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে এটি অন্যতম। ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বলতে বোঝায় অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকর্ম। বিভিন্ন ভারতীয়শাস্ত্রে (মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রশস্তপাদভাষ্য ইত্যাদি) কোন্‌গুলি 'ধর্ম' সে বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও চার্বাকব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলিতে 'ধর্ম' পুরুষার্থ হিসাবে বিবেচ্য। তাই ভারতীয় দর্শনে 'ধর্ম' বিষয়ক আলোচনা নীতিবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'ধর্মনীতি'কে নীতিশাস্ত্রের সাথে অভিন্নার্থে গ্রহণ করা হয়।

বাঙালির দর্শনচিন্তায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণের সময়কালে বাঙালি পাশ্চাত্য দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয় এবং সেই সময়কার বহুবিদ্বৎজনের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। স্বাধীনচেতনা এই মানুষটির রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'ধর্মনীতি'। 'ধর্ম্মনীতি' নামাঙ্কিত পুস্তকটিতে তিনি ধর্মের স্বরূপ, ধর্মনীতি, কর্তব্যকর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল তিনি ধর্ম বলতে কী বুঝিয়েছেন? 'ধর্মনীতি' কথাটিরই বা কী অর্থ? এটি কি তাঁর নীতিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা? তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে পাশ্চাত্য নাকি ভারতীয় নাকি উভয়েরই মেলবন্ধন খুঁজে পাই? বর্তমানে নিবন্ধটি উক্ত সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে প্রয়াসী।

নিবন্ধের আলোচনা অক্ষয় কুমার দত্ত রচিত 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। অর্থাৎ 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটিকে অনুসরণ করেই পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির গ্রহণযোগ্য উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'ধর্ম্মনীতি' নামক গ্রন্থটির অনেকগুলি সংস্করণ রয়েছে। তবে সবকয়টি সংস্করণ অধুনা সহজলভ্য নয়। এখানে একাদশ সংস্করণটিকে অনুসরণ করা হয়েছে।:

গবেষণা পদ্ধতি :

উক্ত প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে মূল সিদ্ধান্তটি নিঃসৃত হয়েছে।

অক্ষয় কুমার দত্তকে অনুসরণ করে ধর্মের প্রাথমিক বর্ণনা :

লেখকের মতে, 'ধর্ম' হল সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ এবং এটি সর্বোৎকৃষ্ট গুণপদার্থ। তিনি বলেছেন যে, একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের পরম প্রার্থনীয় পদার্থ হল সুখ। কিন্তু ধর্ম তার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়সুখের স্বল্পতা ও বৈষয়িক ক্লেষ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে, এমন স্থলে যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মার্থে সুখ বিসর্জন করেও ক্লেশ স্বীকার করে, তাকে আমরা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ বলি। আর যিনি তুচ্ছ সুখান্বেষণে কর্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হন তার প্রতি আমরা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি। যদিও বিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগ পরম পবিত্র কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানকালে নিজ সুখোদ্দেশে কার্য করা ধর্মপ্রবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ নয়।[১] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ১ - ২)

ধর্মের স্বরূপ :

ধর্মের এইরূপ প্রাথমিক বর্ণনাদানের পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, ধর্মের স্বরূপ কি? অক্ষয় কুমার দত্তের মতে, মানুষের মনোবৃত্তি তিনপ্রকার- নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি। তিনি দাবী করেছেন যে, ধর্মের স্বরূপ জানতে হলে এই তিনপ্রকার মনোবৃত্তি ও বিশেষত ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ জানা প্রয়োজন (কারণ ধর্মাধর্ম অবধারণ ও তাদের স্বরূপ এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই সম্ভব)। তিনপ্রকার মনোবৃত্তির বিষদ ববরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন — " *কাম, অপত্যস্নেহ, অর্জ্জনস্পৃহা, জিঘাংসা প্রভৃতির নাম নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি; উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি*

[১] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচারশক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি; আর উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান বৃত্তির নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি।"[২] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ৩)

এখন ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির বিবরণ দিতে গিয়ে, 'উপচিকীর্ষা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে—

"*পরের দুঃখমোচন ও সুখ-বর্দ্ধনের অভিলাষ করা, পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা-বৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য।*"[৩] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ৪)

অর্থাৎ পরের হিতাভিলাষ উপচিকীর্ষার কাজ। নিজ সন্তান, বা মিত্র বা অপর যে কোনো লোকের কল্যাণ প্রার্থনা ও সুখ প্রদান করা এই ধর্মপ্রবৃত্তির মূল কাজ।

'ভক্তি'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"*মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়। পাত্রবিশেষে ভক্তি, মর্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য্য।*"[৪] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ৪)

অর্থাৎ পাত্রবিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এ প্রবৃত্তির কাজ। তবে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ সর্বোতকৃষ্ট। আর 'ন্যায়পরতা' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এ বৃত্তি হল কর্ত্যবাকর্তব্য ও ন্যায্যান্যাযতার প্রতিপাদক। তাঁর মতে, যখন উপচিকীর্ষা বৃত্তি, কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দেয়, এবং ভক্তি, কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান করে, তখন তাদের উপদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যে কর্তব্য কর্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতাবৃত্তির কার্য্য।

"*ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধ। ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও*

[২] তদেব

[৩] তদেব

[৪] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

অভিসন্ধি অবধারণ, এবং তাহার কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে ... ন্যায়পরতা বৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।"[৫] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ৫-৬)

অক্ষয় কুমার দত্তের মতে, ঐ সকল মনোবৃত্তি (নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও তিন প্রকার ধর্মপ্রবৃত্তি) পরস্পর মিলিত হয়ে ও অবিরোধ থেকে যে সকল উপদেশ প্রদান করে, তদনুসারে ব্যবহার হল বৈধ ব্যবহার এবং তার বিরুদ্ধ ব্যবহার হল অবৈধ। বৈধ ব্যবহারের নামই ধর্ম বা পূর্ণ্য। সমস্ত বৈধ কর্মের সাধারণ নাম ধর্ম ও পূর্ণ্য। অর্থাৎ লেখকের মতে ধর্ম ও পূর্ণ্য স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। তিনি আরও বলেন যে,

"*পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্য্যকে বৈধ কার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে, এবং তাহাই ধর্ম ও পূর্ণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়।*"[৬] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ১১)

অর্থাৎ লেখকের কাছে বৈধ কার্য, কর্তব্য, ধর্ম ও পূর্ণ্য শব্দগুলি অভিন্নার্থক। তিনি বৈধ কার্য্য বা কর্তব্যকেই ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

তবে প্রসঙ্গক্রমে দুটি সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। লেখক নিজেই পূর্বপক্ষ হিসাবে আপত্তি দুটি উল্লেখ করে সেগুলি নিরসনের পথও নির্দেশ করেছেন। প্রথমত, অনেক সময় একবৃত্তির সাথে অন্যবৃত্তির বিরোধ দেখা যায়। যেমন- পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্জনস্পৃহাবৃত্তি (এটা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি) পর-ধন হরণের বিধি দিতে পারে কিন্তু ন্যায়পরিতাবৃত্তি (ধর্মপ্রবৃত্তি) তার নিষেধ করে থাকে। তাহলে এরূপ স্থলে কোন্ ব্যবহার কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে, সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। অক্ষয় কুমার দত্তের মতে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বিরোধস্থলে এ দুটি পালন করাই উচিত।—

"*যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি পালনই শ্রেয়।*"[৭] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ১০)

---

[৫] তদেব

[৬] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

[৭] তদেব

তবে একথাও ঠিক যে, যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হবে না, সেই স্থলে কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহায়তাও অবশ্য প্রয়োজন, কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সাথে প্রগাঢ় অপত্যস্নেহরূপ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহযোগে মা তার সন্তানকে যে রূপ যত্ন, ভালোবাসা, উৎসাহের নিয়ে লালন-পালন করেন, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দ্বারা তা সম্ভব নয়। অপত্যস্নেহরূপ বৃত্তিটি থাকার জন্যই সন্তানের প্রতি মায়ের থেকে শুভকামনাকারী আর কেউ হতে পারেন না।[৮] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ১০)

দ্বিতীয়ত, সকল ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি যে সর্বদা একসাথে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করবে, এমনটা নাও হতে পারে। অনেক সময়ই তারা স্বতন্ত্রভাবে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে।[*] লেখকের মতে, এইমত অবস্থায় একটি ধর্মপ্রবৃত্তি যদি অন্যধর্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধিতা না করে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে তবে তা অন্য ধর্মপ্রবৃত্তির দ্বারাও সমর্থিত হবে [†]।[৯] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ১১-১২)

তাই লেখককে অনুসরণ করে বলা যায়, কোন্‌টি কর্তব্য বা ধর্ম ও কোন্‌টি অকর্তব্য তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত নিয়ম অর্থাৎ সকল বৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থেকে যে উপদেশ প্রদান করে সেই অনুসারে ব্যবহার হল ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম, তাই সৎকার্য।

লেখক ধর্মের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে দাবি করেছেন যে, ধর্মাধর্মজ্ঞান বা পাপ-পূর্ণজ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিসিদ্ধ। তাঁর মতে, পূর্ণ ও পাপের পুরস্কার যথাক্রমে আত্মপ্রসাদ এবং আত্মগ্লানি ও গতানুশোচনা। যখন কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির বিপরীতে কাজ করে, তখনই সে পাপপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। তবে আমাদের নিজ অন্তঃকরণ আমাদের সতর্ক করে ও অধর্মের পথ থেকে নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করে। কিন্তু আমরা সেই উপদেশ যত অবহেলা করি তত পাপাচারণে অভস্ত হয়ে পরি, যার ফলে আমাদের গ্লানি ও অনুতাপজনিত যাতনা হ্রাস পেতে থাকে। বারংবার পাপাচারণের

[৮] তদেব

[*] ধরা যাক, একজনব্যক্তি নদীতে পড়ে গিয়েছেন। কোনো দয়ালুব্যক্তি তাকে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন। কাজটি ন্যায় কি অন্যায় তা বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে দয়ালুব্যক্তি কেবল উপচিকীর্ষাবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করেন।

[†] এখন কাজটি ন্যায়সঙ্গতও বটে এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও সম্মতি থাকবে। ফলে কাজটি ধর্ম বা বৈধ ব্যবহার।

[৯] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

দরুন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল ও ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি দুর্বল হতে থাকে এবং ক্রমে ধর্মপ্রবৃত্তির নিষেধ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় ও পরিবর্তে মানুষ নিজেকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অধীন করে ফেলে। তবে রিপু সকল চরতার্থ হলে, অবিলম্বে তা নিরস্ত হয় এবং গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হয়। তখন ব্যক্তির আত্মাই ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে তিরস্কার করে।[১০] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ১৪-১৫)

যদিও লেখক অক্ষয় কুমার দত্ত বলছেন যে, ধর্মাধর্মজ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে ধর্মাধর্ম বিষয়ে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা সাধারন অভিজ্ঞতায় যা পাই তা হল- একই কার্য একজন ব্যক্তির কাছে নিন্দনীয় হয়, আবার অপরব্যক্তির কাছে প্রশংসনীয় হয়। তাহলে যে কার্যটি একব্যক্তির কাছে ধর্ম বা সৎকার্য বলে বিবেচিত হবে তা অন্যের কাছে অধর্ম বলে বিবেচিত হবে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, কর্তব্যাকর্তব্য বা ধর্মাধর্ম বিষয়ক নিরূপক নিয়মের সার্বিকতা কীভাবে বজায় থাকবে? অর্থাৎ কোন্ কর্ম কর্তব্য ও কোন্ কর্ম অকর্তব্য তা সার্বিকভাবে কীভাবে নির্ণিত হবে?

অক্ষয় কুমার দত্তপ্রণিত 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থে লেখক উক্ত সমস্যা সমাধানের বিধানও দিয়েছেন। লেখক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে বারংবার পরমেশ্বর বা জগদীশ্বরের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, পূর্বোক্ত মানসিকবৃত্তিগুলির কোন্‌টি কী কার্য সাধন করবে তা ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত এবং জগদীশ্বর যে কার্য সাধনার্থে যে বৃত্তি সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই কার্যে নিয়োজন করা কর্তব্য।[১১] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ৮) জগদীশ্বর মানুষকে ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করে তার দ্বারা পাপ-পূর্ণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। ধর্মপ্রবৃত্তিকে তাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি বুঝে তার (ধর্মপ্রবৃত্তি) নির্দেশিত আদেশকে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞান করে শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে হবে—

> *"ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব স্বভাবানুসারে ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক আপনাদের সর্ব্বপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে, এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির সহকৃত হইয়া সর্ব-ধর্ম্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের প্রকৃত অনুমতি*

[১০] তদেব

[১১] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্তব্য।"[১২] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ২২)

কিন্তু ১) সকল ব্যক্তির প্রবৃত্তি সমান হয় না (কারও অর্জন-স্পৃহা বেশি, কারও বা ভক্তি ও উপচিকীর্ষা , কারও বা কামপ্রবৃত্তি প্রবল), ২) বুদ্ধিদোষের দরুন কারও বিধেয় ও অবিধেয় কর্মকে যথাক্রমে অবিধেয় ও বিধেয় বোধ হয়, ৩) প্রিয়মানুষের চারিত্রিক বিশ্লেষনে আমরা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাই। তার দোষ-ভাগ লঘু ও গুণ-ভাগ সমান বোধ না হয়ে যথাক্রমে প্রথমটি লঘু ও দ্বিতীয়টি গুরু বোধ হয় (অপ্রিয়মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক বিপরীত বোধ হয়)। -মূলত এই তিনটি কারনে স্থলবিশেষে ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম বলে বিশ্বাস জন্মে।[১৩] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ১৬-২২) এক্ষেত্রে লেখকের মতে, যে সকল ব্যক্তির সকল মানসিকবৃত্তিগুলি স্বভাবত বলবান ও পরস্পর সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং নানা বিদ্যানুশলনের দ্বারা যথাযথভাবে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয়, সেই সকল ব্যক্তির মনোবৃত্তিগুলি পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত হয়ে যে উপদেশ প্রদান করে তাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং এটাই পরমেশ্বরের আজ্ঞা এবং এটাই সৎকার্য ও তা সম্যকভাবে যত্নশীল হয়ে শ্রদ্ধার সহিত পালন করাই কর্তব্য।[১৪] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ১২)

অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অনুসরণ, তাদের অনুশীলন করলে এবং মার্জিত যথোচিত বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করলে, যে কোনো ব্যক্তি কর্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরুপণ করতে সমর্থ হবেন। তখন তিনি ধর্মকে ধর্ম ও অধর্মকে অধর্ম বলেই বুঝবেন। ফলে যে কর্ম ধর্ম বা কর্তব্য তা প্রকৃতপক্ষে সবসময়ের জন্যই ধর্ম। ব্যক্তিভেদে তা পরিবর্তনশীল নয়। তাই বাহ্যত কর্তব্যাকর্তব্য বা ধর্মাধর্ম বিষয়ক নিরূপক নিয়মের সার্বিকতা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে হলেও আদতে তা কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হয় না। বোধকরি লেখক অক্ষয় কুমার দত্ত এই আভাসই আমাদের দিতে চেয়েছেন।

লেখক আরও বলেন যে, পরমেশ্বরই আমাদের দন্ড-পুরস্কারের বিধান দিয়েছেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সমন্ধবিচার' গ্রন্থে তিনি তিনপ্রকার নিয়মের উল্লেখ করেছেন- ভৌতিক নিয়ম, শারীরিক নিয়ম ও

[১২] তদেব

[১৩] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

[১৪] তদেব

মানসিক নিয়ম। [‡] এই নিয়মগুলি পরমেশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এগুলির মধ্যে ধর্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করলে পূর্ণতাজনিত বিশুদ্ধ সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া, লোকনিন্দা, চির-মালিন্য, লোকের নিকট অবিশ্বস্ততা, রাজদ্বারে দন্ড ইত্যাদি ফলভোগ করতে হয়। এই নিয়ম সকলের জন্য কারণ সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা।[১৫] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ২৩) স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত এই ধর্মাধর্মের জ্ঞানকেই তিনি 'কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক নিরূপক নিয়ম' বলে অভিহিত করেছেন।

কর্তব্য-কর্মের বিবরণ :

ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, কোন্ কোন্ কর্ম যথার্থ অর্থে ধর্ম? 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের প্রথম দুইটি অধ্যায়েই ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তী নয়টি অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় থেকে একাদশ অধ্যায়ে তিনি কর্তব্যকর্মগুলি (ধর্ম)-র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি কর্তব্যকর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। আত্মবিষয়ক কর্তব্যকর্ম ও অপরের প্রতি কর্তব্যকর্ম।

আত্মবিষয়ক কর্তব্যকর্ম :

অক্ষয় কুমার দত্তের মতে, জগদ্বীশর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই অভিপ্রায়ে যাতে আমরা ভুমন্ডলে জন্মগ্রহণ করে কতকগুলি কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মধ্যদিয়েই জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি করি পাশাপাশি আমরা সর্বোতভাবে সুখী হই -এটাও পরমেশ্বরের অভিপ্রায়। তাই নিজ বা আত্মপ্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই কারণেই তিনি বিদ্যাশিক্ষাকে সর্বপ্রধান কর্তব্যকর্ম বলে

[‡] জল, বায়ু, স্বর্ণ, মৃত্তিকা ইত্যাদি হল ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে এগুলির কার্য নির্বাহ হয়, তাকে ভৌতিক নিয়ম বলে। যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য নির্বাহ হয়, তাকে শারীরিক নিয়ম বলে। যে সকল জীব বুদ্ধিজীবি, যাদের কেবল নিজের সত্তা বিষয়ে বোধ আছে, সে সকলই মানসিক নিয়মের অধীন। এর মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মবৃত্তি ও নিকৃষ্টবৃত্তি থাকে কিন্তু ইতর প্রাণীর কেবল বুদ্ধিবৃত্তি আর নিকৃষ্টবৃত্তি থাকে ।

[১৫] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

অভিহিত করেছেন। তাছাড়া শারীরিক নিয়ম পালন, ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনকে তিনি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে অভিহিত করেছেন।[§]

অপরের প্রতি কর্তব্য কর্ম :

মানুষ সমাজবদ্ধজীব। তাই সমাজের প্রতি তথা পরিবারের প্রতি তথা অপরের প্রতিও আমাদের কিছু কর্তব্য কর্ম থাকে। কেবল আত্মবিষয়ক কর্তব্য কর্ম সম্পাদন মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। যা সামাজিক প্রগতির অন্তরায়। এরূপ ভাবনা থেকেই লেখক অপরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তার বিবরণ দিয়েছেন। এখানে মূলত গৃহধর্মের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন- উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম, দম্পতির পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, ভ্রাতা-ভগিনীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য। একই সাথে প্রভু-ভৃত্যের উভয়ের পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের বিবরণ দিয়েছেন।[**]

উপসংহার এ যাবৎ যা আলোচিত হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের ধর্ম বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে বিশ্লেষণ করা যাক্। তিনি যখন ধর্মকে গুনপদার্থ হিসাবে উল্লেখ করছেন, সেটি তাঁর ধর্ম বিষয়ক আধিবিদ্যক মত। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'ধর্ম'কে সপ্তপদার্থের গুণপদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল অক্ষয় কুমার দত্ত কর্তব্যকর্মকেই ধর্ম বলছেন আর ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় তাকে ধর্ম বলা হয়।[১৬] (ভট্টাচার্য, ১৯৯০ ডিসেম্বর/ সি, p. ৮৯) অর্থাৎ এ দর্শনে কর্তব্য-কর্মের দ্বারা উৎপন্ন গুণকে ধর্ম বলা হয়েছে।

[§] ধর্ম্মনীতি গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

[**] ধর্ম্মনীতি গ্রন্থের পঞ্চম থেকে দশম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

[১৬] ভট্টাচার্য, ক. (১৯৯০). *ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন.* কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্.

আবার, তিনি যখন ধর্মকে কর্তব্যের (duty) অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করছেন, তখন তিনি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নৈতিকতার[††] দিক থেকে ধর্মের আলোচনা করেছেন কারণ 'কর্তব্য' শব্দের বস্তুগত অর্থ হল 'ধর্ম'।[‡‡] অর্থাৎ ধর্ম বলতে তিনি যখন কর্তব্য কর্ম বা সৎ কর্মকে বোঝাচ্ছেন তখন তিনি ধর্মকে নৈতিক দিক থেকে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের প্রচ্ছদে তিনি 'Principles of Morals In Bengali' ব্যাকাংশটির উল্লেখ করেছেন যার বাংলা অর্থ আমরা করতে পারি এভাবে – 'বাংলাভাষায় কথিত নৈতিকতার নীতিসমূহ'। শুধু তাই নয়, তিনি 'ধর্মনীতি'র অর্থ করেছেন 'কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়িণী নীতি-বিদ্যা'।[§§] তাঁর মতে, যে বিদ্যা অধ্যয়ণ করলে ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়, ও 'কোন্ কোন্ কর্ম যথার্থ অর্থে ধর্ম'- এর বিবেচনা, এই দুটি বিষয়ে অবগত হওয়া যায় তাকে ধর্মনিতি বলা হয়।[১৭] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, p. ৩) ফলে একটা কথা স্পষ্ট যে অক্ষয় কুমার দত্ত 'ধর্ম' বলতে কোনোভাবেই হিন্দুধর্মাদিকে (religion অর্থে) বোঝাননি। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় চিন্তাধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু একদিকে 'ধর্ম' শব্দটির আধিবিদ্যক অর্থপ্রদান, অপরদিকে নৈতিক দিক থেকে তার ব্যাখ্যা দানের বিষয়টিকে আমরা কিভাবে বুঝবো? এখন এর তাৎপর্য ব্যঝতে হলে আমাদের নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝতে হবে। D. S. Sarma তাঁর 'The Path Of Yoga in the *Gitā'* প্রবন্ধে বলেছেন—

[††] ভারতীয় দর্শনে (হিন্দু দর্শনে) দুইভাবে নীতিবিদ্যার আলোচনা করা হয়। একটি হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (subjective standpoint or morality of the Hindus) ও অপরটি হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (objective standpoint or morality of the Hindus)। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিকতা ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযমরূপ শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করে। আর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নৈতিকতা বিভিন্ন বাহ্যিক কর্ম (actions), নিয়মনীতি (norms) যা ভারতীয় শাস্ত্রে ইল্লিখিত আছে, তাকে নির্দেশ করে। (দ্রষ্টব্য : বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় নীতিবিদ্যা, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৮, মুদ্রণ, পৃ-১৫)

[‡‡] সুশীল কুমার মৈত্র তাঁর '*The Ethics Of The Hindus'* গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্ম শব্দটি বিষয়ীগত অর্থে গ্রহণ করলে সৎচরিত্র বা virtue বা কখনো ধর্মীয় সদ্‌গুনকে বোঝায় (the term 'Dharma' is used in the subjective sense of virtue as well as in the sense of religion merit)। আর, যখন বস্তুগত অর্থে গ্রহণ করা হয়, তখন কর্তব্য কে বোঝানো হয় (its objective meaning of duty)। আর কর্তব্য সম্পর্কীত বস্তুগত নৈতকতা হিন্দু নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি (the objective morality of the duties is the ground-work of Hindu Ethics)।

[§§] এটিও প্রচ্ছদেই উল্লেখ করেছেন।

[১৭] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

"*in Hinduism ethics is only a subordinate branch of metaphysics. Ethics is the science of human conduct and character. It is a study of what a man ought to do and to be. But what a man ought to do and to be depends upon the end and aim of human life; and this again depends upon the nature an purpose of the universe, of which he is an integral part. The universe is a vast arena where there is a perpetual conflict going on between the self and the not-self, giving rise to a hierarchical order of dual beings, till at last the dualism of spirit and matter is overcome, and ther sundered spirit regains its original wholeness and becomes absolutely free from any kind of limitation- thus closing one cosmic cycle. This law of spiritual progression in the universe of time and space is one of the fundamental postulates of Hindu speculative thought. And on this law are based the Hindu views of human individuality, of human society, and of human history in general*."[১৮] (Sarma, 2001, p. 400)

সত্তার স্বরূপ, জগৎ, দেশ-কাল, কারণতা, আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু। অপরদিয়ে নীতিশাস্ত্র মানুষের আচার-ব্যবহার, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ঔচিত্য-অনৌচিত্যকে বিচার করে। নীতিবিদ্যার এই সকল আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে মানুষের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জগতের সাথে মানুষের আন্তঃসম্পর্ককে (মানুষ এই জগতেরই অংশ) হিসাবে স্বীকার করা হয়। আদর্শগতভাবে নীতিশাস্ত্র 'কি করা উচিত (what should be)-র উপর গুরুত্ব দেয় আর অধিবিদ্যার দৃষ্টি থাকে 'এটা কি' (what is)-র উপর। আর এটা সহজেই বোধগম্য যে, 'What should be'-র আলোচনা 'what is'-র উপর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, অধিবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। D.S.Sarma তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র প্রসঙ্গে বিষয়টিকে আরেকটু নির্দিষ্ট করেদিলেন এবং বললেন যে, নীতিবিদ্যা হল অধিবিদ্যার অধিনস্ত্য একটি শাখা। মানুষের কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় – নীতিবিওদ্যার এই সকল আলোচনা মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, যা নির্ভর করে বিশ্ব জগতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর, মানুষ যার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বজগৎ একটি বৃহৎ ক্ষেত্র, যেখানে আত্ম-অনাত্মার ক্রমাগত সংঘাত চলে যতক্ষন না আত্মা-অনাত্মার এই দ্বৈততার অবসান ঘটে, ও আত্মা তার অখন্ডতাকে পুণরায় প্রকাশ করতে পারে। যে মুহূর্তে এটা

[১৮] Sarma, D.S. (2001). The Path Of Yoga in the Gitā. In Bhattacharya. H (Ed.), *THE CULTURAL HERITAGE OF INDIA vol.lll*. (Pp-400).The Ramkrishna Mission Instituite of Culture.

সম্ভব হয়, ব্যক্তি যে কোনোপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। দেশ ও কালের জগতের এই আধ্যাত্মিক নীতি ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যতম পূর্বস্বীকৃতি এবং ভারতীয় সমাজ, সেখানকার মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানুষের আচার ইত্যাদি সকল কিছুই এই নীতির উপর নির্ভরশীল।

এখন, অক্ষয় কুমার দত্ত যখন 'ধর্ম' কে উৎকৃষ্ট গুণ পদার্থ বলছেন এবং পাশাপাশি কর্তব্য কর্ম অর্থেও গ্রহণ করছেন তখন তিনি যা বোঝাতে চাইছেন তা অনেকটা এরকম : ধর্ম হল আত্মার গুণ। ধর্ম (এবং জ্ঞান) নামক গুণ থাকার জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে গণ্য হয়েছে। ধর্মপ্রবৃত্তির যথাযথ জ্ঞানলাভ, ধর্মের স্বরূপ বোধ ও ধর্মের অনুশীলন ও পালন করলে মানুষ নৈতিক প্রতিনিধি (moral agent) হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, যথাযথ ধর্মানুষ্ঠান বা পরম পবিত্র পূর্ণ্যক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার হল বিশুদ্ধ-সুখ-সম্ভোগ।[১৯] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ১-২) এই 'বিশুদ্ধ-সুখ-সম্ভোগ' মোক্ষের প্রতিশব্দ কিনা তা তিনি 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থে স্পষ্ট করেননি ঠিকই, তবে এই সুখ যে তৎসদৃশ কিছু, তা বোঝা যায়। আবার একথাও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মতে নিজের সুখ সাধন যদি অন্যান্য কর্তব্যকর্মের বিরোধী না হয়, তবে সেক্ষেত্রে নিজ সুখ সাধন করা যায়। তাছাড়া তিনি সবধরণের ইন্দ্রিয়-সুখ পরিত্যাগ, বা ইন্দ্রিয় সংযম বা ইন্দ্রিয়দ্বার সম্পূর্ণ রোধকে সমর্থন করেননা। কারণ তাঁর মতে পরমেশ্বর মানুষকে যে সকল সুখ-সম্ভোগে সমর্থ্য করেছেন, সেগুলি স্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, নতুবা ঈশ্বরের অবমাননা করা হবে এবং অপরাধী হিসাবে আমরা বিবিধ সুখ থেকে বঞ্চিত হবো।[২০] (দত্ত, ১৮১৬ শকাব্দ, pp. ৪৫-৪৭) অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করেছেন এবং ইহজগৎ তার কাছে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। যদি আধ্যাত্মিক সুখ (বিশুদ্ধ-সুখ-সম্ভোগ) অন্তিম লক্ষ্যও হয় (বিষয়টি অনুমান সাপেক্ষে কারণ তিনি তা স্পষ্ট করেননি ধর্ম্মনীতি গ্রন্থে) তবুও এজীবনের অস্তিত্বকে ও সুখলাভকে তিনি অস্বীকার করছেন না। কিন্তু শর্ত এই যে, তার সাথে কর্তব্য কর্মের (আত্মবিষয়ক ও অপরের প্রতি কর্তব্যকর্ম উভয়ই) বিরোধ হবে না অর্থাৎ নীতিগত হতে হবে।

[১৯] দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি.* ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

[২০] তদেব

আবার দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ধর্ম বা কর্তব্যকর্মের অলোচনা প্রসঙ্গে বারংবার জগদিশ্বরের কথা বলেছেন এবং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এও স্পষ্ট যে তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পূর্ব স্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি 'Divine Origin Argument'[***] (পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট এ তত্ত্বের সমর্থক। তিনি নৈতিকতার পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনেছেন) -কেই স্বীকার করেছেন। এ দিক থেকে বলা যায় তিনি পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[†††]

পরিশেষে বলা যায়, তাঁর নীতিবিষয়ক (morality) চিন্তাভাবনায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটেছে। তিনি দেশীয় চিন্তাধারার সহিত নৈতিকতার ব্যবহারিক দিকটির সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে নীতিসূত্রগুলিকে যুগোপযোগিতার নিরিখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. Maitra, S. K. (1925). *The Ethics of The Hindus.* Kolkata: Calcutta University Press.
2. Sarma, D. S. (2001). *The Path of Yoga in the Gita* (Vol. lll). (H. Bhattacharyya, Ed.) Calcutta: The Ramkrishna Mission Institute of Culture.
3. Tiwari, K. N. (2017). *Classical Indian Ethical Thought A Philosophical Study of Hindu, Jaina and Buddha Morals.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
4. গুপ্ত, দী. (২০১৭). *নীতিশাস্ত্র.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ.
5. চ্যাটার্জী, অ. (Ed.). (২০১৩). *ভারতীয় ধর্মনীতি.* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা.
6. দত্ত, অ. কু. (১৮১৬ শকাব্দ). *ধর্ম্মনীতি* (একাদশ সংস্করণ ed., Vol. প্রথম ভাগ). ক্যালকাটা: হেয়ার প্রেস.

[***] এই যুক্তির অনুযায়ী নৈতিক বিধিগুলি ঈশ্বর দ্বারা আরোপিত, তাই এগুলি অবশ্য পালনীয়।

[†††] তিনি যে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তা 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের বিজ্ঞাপ্ন থেকে স্পষ্ট। তিনি নিজেই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থটি নানা ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। তবে, কোনো গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নয়।

7. দত্ত, অ. কু. (শকাব্দ ১৭৭৩). *বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (Vol. প্রথমভাগ). কলিকাতা: তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত.

8. বাগচী, দী. কু. (২০১৮ জানুয়ারী). *ভারতীয় নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক.

9. ভট্টাচার্য, ক. (১৯৯০ ডিসেম্বর/ সি). *ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন.* কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্.